

[মাশোয়ারা]

প্রস্তুতির লক্ষ্যমাত্রা সম্পন্ন করা যায় কিভাবে?

একদিন সন্ধ্যায় ‘তাতারীদের ইতিহাস’ বই থেকে তালিম করলাম পরিবারে।

একটা বিষয় চিন্তা হলো যে, প্রস্তুতির ঘাটতির পরিণাম সত্যিই অনেক ভয়াবহ।

প্রস্তুতিতে ঘাটতি বলতে সাধ্যের বাহিরের প্রস্তুতির কথা বলতেছি না বরং প্রস্তুতিতে গাফিলতির কথা বলতেছি।

প্রস্তুতিতে গাফিলতি কাটিয়ে প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য কি করা যায় ভাই?

যেমন আমার কথাই ধরি। আমি কয়দিন ব্যায়াম করেছি?

বা প্রস্তুতির এই সময়গুলো যে আমাদের পার হচ্ছে এটুকুকে আমরা কতটুকু ঠিক মত সময়টাকে ব্যবহার করতে পারছি। সেটার কি কোনো পরিসংখ্যান আমার নিকটে আছে কি না।

সাথের ভাই এর সাথে বিষয়টা নিয়ে অনেকক্ষণ এশার নামাজের পর আলাপ করলাম।

তাতে কিছু বিষয়ে এর পাশাপাশি যেটা সবচেয়ে বেশি জরুরী মনে হলো সেটা হলো, তালিম ও তাযকিয়ার ঘাটতি কাটিয়ে উঠা।

ও

সাংগঠনিকভাবে সাপ্তাহিক বা মাসিক প্রস্তুতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও কতটুকু হয়েছে তার পরিসংখ্যান আদায় এর মাধ্যমে আগানো গেলে বেশি ভালো হবে মনে হয়।

প্রস্তুতির লেভেল পার হওয়ার ভিত্তিতে কিছু প্রতিযোগীতা/পুরস্কারের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে তাহলে কমপিটিশন বাড়বে কষ্ট করতেও ভালো লাগবে হয়তো কারো কারো।

প্রস্তুতির বিষয়টাকে ধারাবাহিক সফর মনে করা। এমন যেনো মামুরা মনে না করে যে এখন তো আর জিহাদ শুরু হয়ে যাচ্ছে না। বা এখনো আমার প্রস্তুতি গ্রহণের অনেক সময় আছে। শয়তান মূলত ধোঁকাটা এরকমই দেয় যে তুমি তো নেক আমলটা করবে কিন্তু একটু পরে করো। অর্থাৎ তাবুকের যুদ্ধ না গিয়ে বসে থাকা ০৩ জন সাহাবীর মতো হয়ে না যায় যারা ভেবেছিলো আমরা কিছু পরে গিয়ে রাসুল (সা) এর সঙ্গী হয়ে যাবে, কিন্তু পরে আর তারা তা করতে পারেনি। এজন্য আমার মনে হয় প্রস্তুতির লেভেল পার হওয়ার বিনিময়ে মামুরদেরকে ছোটো ছোটো প্রজেক্টে কাজে লাগানো এবং তাদের চাক্ষা রাখা।

যেমন উদাহরণত আমার কথাই বলি। ব্যায়াম শুরু করার ক্ষেত্রেই আমার যত কষ্ট/অলসতা কেনো জানি অনুভব করি। কিন্তু যখন একবার ব্যায়াম শুরু করে দিই তখন ব্যায়াম করতে ভালোই লাগে। তখন মনে হয় যে সারাদিন ব্যায়াম করতেও সমস্যা নাই ইনশা-আল্লাহ।

মুজাহিদ্দীনদের মাঝে শত্রুর বদলে আল্লাহকে ভয় করা ও নিয়মিত প্রস্তুতি গ্রহণের বিষয়টাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এখন থেকেই প্রস্তুতির লক্ষ্যমাত্রা কতটুকু অর্জিত হলো এর হিসাব না নিলে পরবর্তীতে দেখা যাবে যে, আমার মতো সবাই ভাবতে থাকবে যে হ্যাঁ আমরা তো প্রস্তুত হচ্ছিই। কিন্তু যখন যুদ্ধের ময়দানে দাড়াবে উভয় পক্ষ তখন প্রস্তুতিতে গাফিলতির জন্য আমাদের যেনো আফসোস না হয়। এবং পরিণাম যেনো তাতারীদের সময়ে বাগদাদের মুসলিমদের মতো না হয়। পরিণাম যেনো প্রস্তুতির ঘাটতির কারণে যুদ্ধ থেকে পলায়নের মানসিকতা না হয়। এজন্য এখন থেকেই প্রস্তুতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও এর হালনাগাদ সর্বোচ্চ গুরুত্ব ভিত্তিতে ফাইলাকারে হিসাব রাখা প্রয়োজন মনে করছি।

প্রস্তুতি বলতে শারিরীক, মানসিক, আর্থিক, সামরিক সবগুলো বিষয়ে সামষ্টিক ভাবে সময় অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে পরিসংখ্যান আদায় করাকে বুঝাচ্ছি। এবং সাথে টুকটাক কাজ চালিয়ে যাওয়া যাতে প্রস্তুতির বাস্তবতা প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকে এবং প্রস্তুতি গ্রহণের আগ্রহ আরো বাড়ে সবার মাঝে।

আমাদের মাসুলদের নিকট যখন নতুন নতুন কাজ আসে তখন এই প্রস্তুতির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কতটুকু সম্পন্ন হয়েছে তার হিসাবের কাজটা যেনো নিচে পড়ে না যায় বা গুরুত্ব কমে তালিকায় না চলে আসে।

বরং আমি মনে করি প্রস্তুতির এই ফাইলকে টপ প্রায়োরিটি এবং রেগুলার টাস্ক এবং ব্যক্তি বিশেষে ফ্রী সময় অনুযায়ী বাধ্যতামূলক ওয়ার্ক হিসেবে নিয়মিত আদায় করে নেয়া।

অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ টাস্ক প্রাথমিক ভাবে নিয়মিত হতে থাকে কিন্তু পরবর্তীতে তা বিভিন্ন প্রেশার ও নতুন কাজের ভিড়ে হারিয়ে যায় প্রস্তুতির প্রশ্নে এরকম না হওয়া।

বিজয় তো মুমিনদেরই হবে কিন্তু যারা আমার মতো গাফেল তাদেরকে সামনে এগিয়ে আনার জন্য প্রস্তুতির হিসাব নিয়মিত আদায় না করলে তারা হয়তো এক সময় মুমিনদের বিজয় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে কিন্তু তার পূর্বে যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে তারা ময়দান থেকে পালায়ন করবে। আল্লাহ আমাদের নিফাক ও মুনাফিক থেকে হেফাজত করুন।

- তানজীমের এক অলস ভাই -

‘তাতারীদের ইতিহাস’ বই থেকে যেটুকু তালিম করেছিলাম তা পরের পেজগুলোতে।

দ্বিতীয় বিপদ : আলাতোলিয়া ও মসুলের নেতৃবর্গের পক্ষ থেকে বড় ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা হয়েছে। আর তাদের এই বিশ্বাসঘাতকতা তাতারী বাহিনীর দ্বার খুলে দিয়েছে। ফলে কোনো প্রতিরোধ দানা বাধেনি। তাতারীরা ধীরশান্ত মনে বাগদাদে অনুপ্রবেশ করে। যেন তারা বনভোজনের যাত্রা করছে। বাগদাদ খেলাফতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকায় পশ্চিমধ্যে তারা কোনো হত্যাকাণ্ড ঘটায়নি। আর তাদের অনিষ্ট থেকে সাময়িকভাবে বাঁচতে পেরেই সবাই সন্তুষ্ট থাকে। পরবর্তী বিপদের আশঙ্কায় কেউ তাদের বিরুদ্ধে সাহসী ভূমিকা রাখে না। এটি ছিল আলাতোলিয়ার আমীর কেকেভাস ছানী ও কালাজ আরাসলান রাবে' এর পক্ষ থেকে চরম বিশ্বাসঘাতকতা এবং মসুলের আমীর বদর উদ্দীনের পক্ষ থেকে জঘন্য প্রতারণা।

বদর উদ্দীন লুলু কেবল তাতারীদের সম্মান প্রদর্শনই করেনি, কেবল দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে তাদের সেবায়ত্নই করেনি, বরং আব্বাসী শাসন থেকে ইরাকমুক্ত করার জন্য তাতারীদের সঙ্গে একদল সেনাও পাঠিয়েছে!!

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা অতি গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি। তা হলো, যখন বদর উদ্দীন লুলু এই বিশ্বাসঘাতকতা করে, তখন তার বয়স ছিল আশি বছর। কেউ কেউ বলেন একশো বছর!! আরও উল্লেখের বিষয় হলো, এই বিশ্বাসঘাতকতার কয়েক মাস পরই সে ইন্তেকাল করে!!!

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে শুভ সমাপ্তি দান করুন।

এই ছিল তাতারী বাহিনীর বাগদাদ আক্রমণের পূর্বপ্রস্তুতি।

বাগদাদ অধঃপতনের কারণ

তৎযুগে বাগদাদ ছিল পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী সুরক্ষিত শহর। এর প্রাচীর ছিল ইস্পাতকঠিন। তা ছিল পাঁচ যুগ পূর্বকার মুসলিম খেলাফতের রাজধানী। শহরের সুরক্ষার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়। কিন্তু হায় আফসোস! শত আফসোস এই সুরক্ষিত শহরটির প্রতি!!

শহরের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজন ছিল শক্তিশালী কিছু লৌহমানব। কিন্তু সেই যুগে লৌহমানবের স্বল্পতা দেখা দিয়েছিল! আব্বাসী খেলাফত আমলে কে এই সুবিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিল? তিনি ছিলেন বনী আব্বাসের শেষ ও সাইত্রিশতম খলিফা। তিনি ছিলেন মুসতা'সিম বিল্লাহ!

কী মহান তার নাম ‘মুসতা‘সিম বিল্লাহ’ (আল্লাহর আশ্রয়গ্রহণকারী) কী মহান তার উপাধি ‘খলিফাতুল মুসলিমীন’ (মুসলমানদের প্রতিনিধি)।

কোথায় খলিফা মুস্তাসিম বিল্লাহর খেলাফতের (প্রতিনিধিত্বের) প্রতিফলন?

আপনি যদি সীরাতের কিতাবাদি—যেমন : সুযুতী রহ. রচিত তারীখুল খুলাফা, ইবনে কাছীর রহ. রচিত আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ইত্যাদি কিতাবাদিতে—খলিফার গুণাবলি পাঠ করেন, তাহলে একটি অদ্ভুত বিষয় জানতে পারবেন। দেখতে পাবেন, তারা ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবনে একজন শ্রেষ্ঠ মানুষের বিবরণ তুলে ধরেন। (যেমন : তারা বলেন, উত্তম গুণাবলি সম্পন্ন একজন মানুষ।)

আল্লামা ইবনে কাছীর রহ. বলেন, খলিফা মুসতা‘সিম বিল্লাহ ছিলেন সুদর্শন, চরিত্রবান, বিশুদ্ধ আকীদাসম্পন্ন, ন্যায় প্রতিষ্ঠার পিতা মুসতানছির বিল্লাহর অনুসারী, তিনি প্রচুর দান-সদকা করতেন। উলামা মাশায়েখ ও সাধারণ মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন। মাযহাবগত দিক থেকে তিনি সালাফী ছিলেন।

আমি জানি না সালাফী বলে ইবনে কাছীর রহ. কী বুঝাতে চেয়েছেন?!

সলফের (পূর্বসূরীদের) ধর্মে কি জিহাদ ছিল না?

সলফের (পূর্বসূরীদের) ধর্মে কি জিহাদের প্রস্তুতির নির্দেশ ছিল না?

সলফের (পূর্বসূরীদের) ধর্মে কি ভৌগলিক জ্ঞানের পাঠ হতো না?

ইরাক, পারস্য, আযারবাইজান ইত্যাদি অঞ্চলে মুসলিম-নিধন দেখে, মুসলমানদের রক্তপাত হতে দেখে কি সলফের (পূর্ববর্তীদের) গায়ে জ্বলন সৃষ্টি হতো না? তারা কি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হতেন না?

সলফের ধর্মে কি ঐক্য, ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব, শ্রদ্ধা ছিল না?

খলিফা মুসতা‘সিম বিল্লাহ ব্যক্তিগতভাবে সং ও মার্জিত ছিলেন। তবে তার মাঝে কতিপয় গুণাবলির অভাব ছিল। মুসলিম শাসকের মাঝে সেসব গুণাবলির অভাব থাকতে পারে না।

তারা মাঝে রাজনৈতিক সংকট ও জটিলতা নিরসনশক্তির অভাব ছিল।

তার মাঝে যথাযথ নেতৃত্বের অভাব ছিল।

তার মাঝে উঁচু মনোবল ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাব ছিল।

অভাব ছিল দীন প্রচারের ও শত্রুর ওপর জয়লাভের।

তার মাঝে উপযুক্ত সময়ে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার অভাব ছিল।

তার মাঝে অনৈক্য দূরীকরণ, ইসলামী ঐক্যের পতাকা উত্তোলন এবং সকলকে এক কাতারে দাঁড় করানোর ক্ষমতা ছিল না।

তার মাঝে সংসঙ্গী নির্বাচনের অভাব ছিল। ফলে তার চারপাশে অসং সঙ্গের ভিড় জমেছিল। মন্ত্রীরা চুরি করত। পুলিশরা অত্যাচার করত। আর সেনাপতিরা ছিল ভীরু।

তার মাঝে দুর্যোগ ও বিপর্যয় রোধ করার ক্ষমতা ছিল না। ফলে ফেতনা-ফ্যাসাদ ব্যাপক হয়েছিল। সরকারি সম্পত্তি লুট হতো। সুদ ও ঘুষের প্রচলন বৃদ্ধি পেয়েছিল। গান-বাদ্য, খেলতামাশা ও আড্ডাখানা বৃদ্ধি পেয়েছিল; এমনকি প্রকাশ্যে এসবের ঘোষণা দেওয়া হতো।

হ্যাঁ! দ্বীনের রুকন আরকান তথা নামাজ, রোজা, যাকাত আদায়ে তিনি ছিলেন সৎপরায়ণ। তার ভাষা ছিল সুমিষ্ট। তিনি গরিব-গুরাবা ও আলেম-উলামাদের ভালোবাসতেন। এসব কিছু তার দায়িত্ব পরায়ণতার পরিচায়ক ছিল। তবে দেশ জাতি ও উম্মাহর প্রশ্নে তার দায়িত্বপরায়ণতা কোথায় ছিল?!

দেশ ও জাতির প্রশ্নে খলিফা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

তখনো ইরাকে সাধারণ জনগণ ছাড়াই এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য অবস্থানরত ছিল। বাগদাদ অবরোধকারী তাতারীদের সৈন্য সংখ্যা ছিল দুই লক্ষ। তখন তাতারীদের মুকাবেলায় রুখে দাঁড়ানো খুবই সহজ ছিল। কিন্তু খলিফার হৃদয় ছিল পরাজিত। সেই প্রাণ তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন, যা শত্রুর মুকাবেলায় রুখে দাঁড়াতে শক্তি জোগায়। তাই তিনি তার জাতিকে জিহাদের শিক্ষা দেননি এবং সমরবিদ্যায় পারদর্শী করেননি।

কোথায় আজ ট্রেনিং-ক্যাম্প, যা বর্তমান যুবক সমাজকে প্রস্তুত করবে?!

কেন আজ সাঁতার কাটা, তীর নিক্ষেপ ও ঘোড়া-দৌড়ের প্রতিযোগিতা হয় না?!

কোথায় জাতির নৈতিক সংগ্রামের জীবনযাপনের প্রস্তুতি?!

আমি খলিফার পক্ষাবলম্বন করছি না।

খলিফা মুসতা‘সিম বিল্লাহ প্রায় ষোলো বছর স্বদেশ শাসন করেছেন।

তিনি হঠাৎ কোনো নির্দেশ দেননি। তড়িৎগতিতেও কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি।

তিনি লালিত-পালিত হয়েছেন খলিফা হওয়ার জন্য। তিনি রাজত্বভার গ্রহণ করেছিলেন একত্রিশ বছর বয়সে। তখন তিনি ছিলেন টগবগে পরিপক্ব সচেতন যুবক। দেশ পরিচালনার জন্য তিনি পূর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন। পূর্ণ ষোলো বছর

তিনি দেশ শাসন করেন। সুতরাং যদি তিনি যোগ্য হন তাহলে তার দায়িত্ব হলো প্রতিশ্রুতি দেওয়া, দেশকে শক্তিশালী করা, দেশের ভাবগাম্ভীর্য তুলে ধরা, মর্যাদা উন্নত করা, সৈন্যদলকে প্রস্তুত করা, দেশের পতাকা উত্তোলন করা। আর যদি তিনি যোগ্য না হন, যদি তিনি সৎ হয়ে থাকেন তাহলে তার উচিত হলো, যোগ্য লোকের জন্য ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া। এটা কোনো পরিবার বা গোত্রের বিষয় নয়, এটা এক জাতির প্রশ্ন, ...বিশাল জাতির বিষয়! এমন এক জাতির বিষয়, মানবকল্যাণে যাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু খলিফা এই দুই কাজের কোনো একটিও করেননি। নিজে যোগ্যতার পরিচয় দেননি। আবার ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াননি। এ কারণেই তাকে মূল্য দিতে হয়েছে। আর যে জাতি তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল, আবশ্যম্ভাবীরূপে তাদেরও মূল্য দিতে হয়েছে।

যে পরিমাণ আমানত নষ্ট হয়েছে, খলিফা ও তার জাতিকে সে পরিমাণ মূল্য দিতে হবে? আপনারা দেখবেন সেই মূল্য কত বৃহদাকার হয়!!

দেশে অস্ত্র কেনার বা তৈরি করার জন্য অর্থের কোনো অভাব ছিল না। এমনকি গুদাম গুদাম অস্ত্র পড়ে ছিল। তবে হয়তো তা পুরোনো ক্ষয়প্রাপ্ত অস্ত্র, যা বহুদিন ধরে পড়ে আছে, যা আর শান দেওয়া হয়নি। অথবা নতুন অস্ত্র, যা একবারও ব্যবহার করা হয়নি, আফসোস! (চরম আক্ষেপ) কেউ অস্ত্র প্রশিক্ষণ নেয়ইনি!!

ফলে আব্বাসী সৈন্যবাহিনী দুর্বল ক্ষীণকায় হয়ে পড়েছে। যারা ছোট কোনো রাজত্ব সুরক্ষিত রাখার যোগ্য ছিল না; সুবিশাল খেলাফত তো বহু দূরের কথা!

এই ছিল বাগদাদ নগরীর খলিফার অবস্থা!!

আর বাগদাদের অবস্থা কী ছিল? বাগদাদের রাজত্ব কেমন ছিল?

বাগদাদের হুকুমত সৈন্যবাহিনীর মতই দুর্বল: রুগ্ন ও শীর্ণকায় ছিল।

মন্ত্রী পরিষদের মনমতো পরিচালিত হতো তাদের লক্ষ্যই ছিল ধন-সম্পদ ও অর্থ-কড়ি সংগ্রহ করা, ক্ষমতার বাগডোর সর্বত্র ছড়িয়ে রাখা, সাধারণের গলায় রাজত্বের রশি ঝুলিয়ে রাখা, তাদের সঙ্গে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করা এবং অট্টালিকা, ক্ষমতা কিংবা নারীর জন্য লড়াই করা। এই অধঃপতিত মন্ত্রীসভার প্রধান ছিলেন বিশ্বাসঘাতক প্রধানমন্ত্রী, যিনি দেশ ও জাতিকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। যিনি উম্মাহর শত্রুদের বন্ধু, পরবর্তী প্রজন্মের শত্রুদের বন্ধু। মন্ত্রীদের সঙ্গে সাধারণ মুসলমান, যারা তাদের জান-মাল দিয়ে রক্ষা করে,

তাদের সুসম্পর্ক ছিল না। তাদের সঙ্গে ভাইয়ের মতো সম্পর্ক ছিল না; বরং গোলাম মুনিবের সম্পর্ক ছিল।

বাগদাদের নাগরিকদের অবস্থা কী ছিল?

তাদের স্বভাব-প্রকৃতি কেমন ছিল? তাদের উচ্চাভিলাষ কেমন ছিল?

আপনারা ভাববেন না, তারা এক দুর্বল বা পরাজিত খলিফার মাজলুম প্রজা ছিল।

প্রজাদের আমল অনুযায়ী শাসক নিযুক্ত হয়

তৎকালে বাগদাদে অসংখ্য জনগণ বাস করত। তাদের সংখ্যা ছিল কমপক্ষে তিন কোটি। এ কারণেই তৎকালে বাগদাদ ঘনবসতিসম্পন্ন বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হিসেবে গণ্য করা হতো। সুতরাং বোঝা গেল, বাগদাদে জনশক্তির কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু তারা ছিল বিলাসপ্রিয়। তারা শান্তিশিষ্ঠ ও আরামপ্রিয় জীবনযাপন করত। দীনদারিত্বের অবস্থা এই ছিল যে, তারা ইলমে দীন অর্জন করত, মসজিদে নামাজ আদায় করত, কুরআন তেলাওয়াত করত। তবে ‘এ’লায়ে কালিমা তুল্লাহ’ তথা আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ফরিজা নির্ধারণ করেছেন তথা জিহাদকে তারা ভুলে গিয়েছিল। পক্ষান্তরে দীনদারির সঙ্গে যাদের সম্পর্ক ছিল না, তাদের অবস্থা ছিল, তারা মনচাহে জীবনযাপন করত। ভোগ বিলাসে মত্ত ছিল। খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, দাস-দাসী, ঘর-বাড়ি ইত্যাদিতে তারা ডুবে ছিল। কেউ কেউ তো কুরআন হাদীস ছেড়ে গান-বাজনা শ্রবণ করত। কেউ মদ পান করত, কেউ চুরি করত, কেউ অপরের প্রতি জুলুম করত। এর চেয়ে জঘন্য বিষয় হলো, তারা দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে পার্শ্ববর্তী দেশ আফগানিস্তান, উজবেকিস্তান, তুরমিনিস্তান, পারস্য, আযারবাইজান ও শিসানবাসীর গগন জাগানিয়া আর্তনাদ শুনে একটুও সহানুভূতি প্রকাশ করেনি; তাদের আত্মমর্যাদায় একটুও আঘাত হানেনি। তারা মুসলিম অবলা হাজার হাজার নারীদের বন্দীর আওয়াজ শুনে একটুও নড়ে চড়ে বসেনি। মুসলমান সন্তানদের ছিনিয়ে নিতে দেখে তাদের হৃদয়াত্মা একটুও ব্যথিত হয়নি। ধন-সম্পত্তি চুরি হতে দেখে, ঘর-বাড়ি ধ্বংস হতে দেখে, মসজিদ জ্বালিয়ে দিতে দেখে তাদের ভেতরে ‘আহ!’ শব্দও উচ্চারিত হয়নি; এমনকি তারা তাদের খলিফা

মুসতা‘সিম বিল্লাহকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাতারীদের সহযোগিতা করতে দেখে নীরব ভূমিকা পালন করেছিল। তার এসব কিছু দেখে-শুনে, বরং এরচেয়ে বহু গুণ বেশি অত্যাচার জুলুম দেখে একটুও হরকত করেনি; পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

সুতরাং যেমন কর্ম ফল তেমনই হওয়া আবশ্যিক ছিল!!

যেমন কর্ম তেমন ফল

শীঘ্রই এমন এক সময় আসবে, যখন এই জনপদবাসী অন্যান্য মুসলিম জাতি যে আজাব ভোগ করেছে, হুবহু তা-ই ভোগ করবে। তখন তাদের জন্য একজন মুসলমানও সহানুভূতি প্রদর্শন করবে না। এমনকি তাতারীরা তাদের বিরুদ্ধে সহযোগিতা প্রদান করবে, যেমন আজ তারা তাদের ভাইদের বিরুদ্ধে তাতারীদের সহযোগিতা করেছে। এভাবেই চলতে থাকবে।

কেউ বলবে না, তারা নিজেদের কারণে পরাজিত হয়েছে; বরং বিষয় হলো, যেই জনপদ শরীয়ত বিরুদ্ধ কাজ মেনে নিতে পারে, তাদের বেঁচে থাকার কোনো অধিকার থাকে না। যেই জাতি কেবল জীবন ভোগ করতে জানে, এই উদ্দেশ্যেই বেঁচে থাকে, সমাজে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াবার কোনো অধিকার তাদের থাকে না।

কোথায় উলামা-মাশায়েখের জামাত?

কোথায় বীর যোদ্ধারা?

কোথায় যুবক-সমাজ?

কোথায় মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ?

কোথায় সংকাজের আদেশ দাতারা?

কোথায় অন্যায় কাজে বাধা প্রদানকারী?

কোথায় ঘুণেই ধরা সমাজের সংশোধনী পদক্ষেপ?

কোথায় দ্বীনের সঠিক বুঝ?

বাগদাদে কি কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি ছিল না?

এই ছিল বাগদাদের অধঃপতন। আর বাগদাদের বাইরের অবস্থা আপনারা জানেন। সেখায় তাতারী বাহিনী মুসলমানদের শান্তি প্রদানের জন্য অগ্নি প্রজ্বলন করছিল। আর মুসলমানরা নীরবে শান্তি ভোগ করছিল!!

অবরোধের সূচনা!!

১২ মুহাররম ৬৫৬ হিজরীতে হালাকু খানের দল আকস্মিক বাগদাদ নগরীর পূর্ব প্রাচীরের সামনাসামনি এসে দাঁড়ায়। হালাকু খান শহরের চারপাশে অবরোধের সরঞ্জামাদি স্থাপন শুরু করে। অপর দিকে পূর্ব-দক্ষিণ দিক থেকে কাতবুগা দলবল নিয়ে এসে উপস্থিত হয়।

তাতারী বাহিনীর দুর্ধর্ষ দুই দলের আকস্মিক আগমন দেখে খলিফাতুল মুসলিমীন আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। দ্রুত বিশিষ্ট উপদেষ্টাবৃন্দকে একত্রিত করেন। যাদের প্রধান ছিলেন বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী মুআইয়িদ উদ্দীন আলকামী।

এমন দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে আমরা কী করব?

মুক্তির পথ কী?

কোথায় পালাবার স্থান?

فَتَادَوْا وَلَا تَحِينَ مَنَاصٍ

“তারা আতঁচিৎকার করেছিল। কিন্তু তখন পালাবার কোনো পথ ছিল না।”^{৪৪}

উযীর মুআইয়িদ উদ্দীন আলকামী ও তার সহোদররা তাতারীদের পক্ষ সমর্থন করে তাদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাকিদ প্রদান করে। সামান্য পতন কিংবা সামগ্রিক পতন ঘটলেও তাদের বাধা দেওয়ার মতো কিছু ছিল না। মুআইয়িদ উদ্দীন তাতার ও মুসলমানদের ভেতর সুযোগ সন্ধান করছিল, যাতে তাতারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কিংবা রুখে দাঁড়াবার কোনো চিন্তা অবশিষ্ট না থাকে।

শর্তহীন শান্তিচুক্তি ছিল তাদের পরামর্শ।

একথা অনস্বীকার্য সে, মুসলিম উম্মাহ কখনো কল্যাণশূন্য হবে না। দু’জন মন্ত্রী দাঁড়িয়ে খলিফাকে জিহাদের ইঙ্গিত প্রদান করে। ‘জিহাদ’ শব্দটি আব্বাসী সাম্রাজ্যের এই প্রজন্মের কাছে ছিল একটি নতুন শব্দ। কিন্তু তাদের কাছে জিহাদ শব্দটি নতুন ও অদ্ভুত হলেও তা প্রত্যাখ্যান করার কোনো উপায় ছিল না।

মুজাহিদ উদ্দীন আইবেক ও সুলাইমান শাহ প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য উৎসাহিত করেন। কিন্তু সময় ফুরিয়ে যাওয়ার পর তারা এই ইঙ্গিত প্রদান

^{৪৪} সুরা সাদ : ৩।

করেছেন। শুধু সময় ফুরিয়ে বললে ভুল হবে, বরং বহু পরে তারা এই উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। কারণ, জিহাদের প্রস্তুতির সময় অনেক পূর্বেই শেষ হয়ে গেছে। সামনে পরীক্ষার সময় অত্যাশঙ্ক। হতে পারে, হয়তো তারা অনেক দিন থেকে জিহাদের পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু কেউ তাদের কথায় কর্ণপাত করেনি। মুআইয়িদ উদ্দীন ও মুজাহিদ উদ্দীন আইবেকের মধ্যকার সম্পর্কে দীর্ঘদিন ধরে টানাপোড়া চলছিল। বিশ্বাসঘাতকের সম্পর্কে টানাপোড়া থাকাই আবশ্যিক। কিন্তু আফসোস! খলিফা বিশ্বাসঘাতকদের কথা দীর্ঘদিন ধরে মেনে আসছে!!

খলিফা হতভম্ব!!

মুআইয়িদ উদ্দীনের কথার প্রতি সে দুর্বল।

তার অন্তর যুদ্ধ করতে শক্তি পাচ্ছিল না।

কিন্তু বিবেক মুজাহিদ উদ্দীন আইবেকের কথার প্রতি সায় দিচ্ছে। কারণ, তাতারীদের ইতিহাস শান্তির ইতিহাস নয়। যেমন কখনো শোনা যায়নি, তাতারীরা অধিকার প্রদান করে; বরং তারা অধিকার ছিনিয়ে নেয়।

খলিফা বিবেকশূন্য হয়ে পড়েন। শেষমেশ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আলহামদুলিল্লাহ! তিনি বিবেকের কথা শুনেছেন। তিনি জিহাদের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু দ্বন্দ্বপূর্ণ দুর্বল মনোবলহীন!!

এভাবে জিহাদ কোনো উপকারে আসে না।

জিহাদ কখনো অপরিকল্পিতভাবে হয় না।

হঠাৎ করে মুজাহিদ সৃষ্টি হয় না!!

জিহাদ হলো প্রস্তুতির নাম। পরিচর্যার নাম, আত্মবিসর্জনের নাম এবং ঈমানের পথে দীর্ঘদিনের পরামর্শ ও পর্যালোচনার নাম।

জিহাদ সম্মুখপানে অগ্রসর ... উর্ধ্বগামী ... উর্ধ্বগামী ... উর্ধ্বগামী। ইসলামের স্বর্ণশিখরে পৌছা পর্যন্ত। তবে আমরা সর্বাবস্থায় জিহাদ করব (অভিজ্ঞতার আলোকে)। খলিফা জীবনে একবারের জন্য হলেও সেনাবাহিনীর খেদমত করার ইচ্ছা করল!

এরপর মুজাহিদ উদ্দীন আইবেকের নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র দুর্বল দল হালাকু খানের সঙ্গে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে বের হলো। আক্বাসী বাহিনী বের হতে না হতেই এবং হালাকু খানের মুখোমুখি হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ না করতেই সংবাদ এল, উত্তর দিক থেকে আরেকটি তাতারী বাহিনী আগমন করছে। সেটি হলো

তাতারী সেনাপতি পোয়গেয়টের দল, যারা ইউরোপ থেকে তুরস্ক ও উত্তর ইরাক পাড়ি দিয়ে এসেছে। এই দলটি দাজলা নদীর পূর্বাঞ্চলীয় ইরাকভূমি পাড়ি দিয়ে দাজলা নদীর পশ্চিমাঞ্চল মসুল পৌঁছেছে। এরপর সেখান থেকে দাজলা ও ফুরাত নদীর মধ্যবর্তী অপরূদ্ধ অঞ্চল থেকে মাত্র পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে। তারা যখন উত্তর বাগদাদে অবস্থান করছিল, তখন মুজাহিদ উদ্দীন আইবেক তাদের আগমন-সংবাদ পান।

মুজাহিদ উদ্দীন আইবেক অনুধাবন করেন, যদি এই দলটি বাগদাদ পৌঁছে, তাহলে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণ করবে এবং এর মাধ্যমে মুসলিম প্রাচীন রাজধানী চারদিক থেকে অপরূদ্ধ হয়ে পড়বে। তাই তৎক্ষণাৎ মুজাহিদ উদ্দীন আইবেক পোয়গেয়টকে প্রতিহত করতে দাজলা ও ফুরাত নদীর উত্তর দিকে যাত্রা শুরু করেন। আশ্বার নামক স্থানে তারা মুখোমুখি হয়। এটি সেই স্থান যেখানে পাঁচশ বছর পূর্বে মুসলিম সেনাপতি খালেদ বিন ওয়ালিদ রা. বিজয় লাভ করেছিলেন। কিন্তু আফসোস! এবার মুসলিম নেতা জয় লাভ করতে পারেনি।

পোয়গেয়ট প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে। সে মুসলমানদের সামনে থেকে ফিরে যেতে উদ্যত হয়। মুসলমানরা পিছু ধাওয়া করে। একসময় তারা ফুরাত নদীর নিকটবর্তী এক জলাভূমিতে গিয়ে উপস্থিত হয়। এরপর পোয়গেয়ট তাতারী প্রকৌশলীদের নদীর বাঁধ কেটে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। যাতে আব্বাসী বাহিনী ফিরে যেতে না পারে। এরপর পোয়গেয়ট ইরাকী বাহিনীকে অবরোধ করে এবং ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। মুজাহিদ উদ্দীন আইবেক সামান্য কয়েকজন সৈন্যবাহিনী নিয়ে নদীর পাড় দিয়ে বাগদাদ ফিরে যেতে সক্ষম হন। কিন্তু আফসোস! অসংখ্য সৈন্য আশ্বার অঞ্চলে নিহত হয়।

১৯ শে মুহাররম এই অপূরণীয় ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হয়। অর্থাৎ হালাকু খান বাগদাদ পৌঁছার এক সপ্তাহ পর এই দুর্ঘটনা ঘটে। এদিকে পোয়গেয়ট কালক্ষেপণ না করে তৎক্ষণাৎ পরের দিনই উত্তর দিক থেকে বাগদাদ পৌঁছে যায়। অতঃপর বাগদাদের পশ্চিম দিক থেকে অবরোধ শুরু করে। বাগদাদ নগরী পূর্বে হালাকু খান ও পশ্চিমে পোয়গেয়ট; এই দুই বাহিনীর মাধ্যমে অপরূদ্ধ হয়ে পড়ে। অপরূদ্ধ হয় ইসলামী খেলাফতের ঐতিহ্যবাহী রাজধানী। খলিফাতুল মুসলিমীন কল্পনাও করেননি যে, এভাবে অবরোধের শিকার হবেন। তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন, বিবেক বিস্মৃত হন!!

সুযোগ-সন্ধানী উযীর মুআইয়িদ উদ্দীন এটাকে বড় সুযোগ মনে করে। সে খলিফাকে সম্বোধন করে বলে, খলিফাতুল মুসলিমীন! আমাদের তাতারীদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সংলাপে বসা উচিত। কিন্তু খলিফা জানতেন, তাদের সঙ্গে সংলাপে বসা মানে হলো, শক্তিশালীর সঙ্গে অতি দুর্বলের বৈঠক। তাং কোনো ফল বয়ে আনবে না। কারণ, মুআইয়িদ উদ্দীনের উদ্দেশ্য সংলাপ নয়; বরং আত্মসমর্পণ। আর আত্মসমর্পণ অর্থ হলো প্রণীতভাবে বিজয়ীর যাবতীয় শর্ত মেনে নিয়ে পরাজয় মেনে নেওয়া।

এতদসত্ত্বেও নিরুপায় হয়ে অসহায় খলিফা মাথানত করে আত্মসমর্পণকেই মেনে নিলেন। তিনি সংলাপে একমত হলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, তার পক্ষ থেকে সংলাপের জন্য দুজনকে পাঠাবেন। কোন দুজনকে পাঠাবেন?

তিনি শীয়া মতালম্বী মুআইয়িদ উদ্দীন আলকামীকে পাঠালেন, যে অন্তরে আব্বাসী সাম্রাজ্যের প্রতি ঘোর বিদ্বেষ লালন করে এবং বাগদাদের খ্রিস্টান কুলপতি মাকিকাকে পাঠান। এভাবে ইসলামী সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সংলাপের জন্য প্রতিনিধি হিসেবে দুজনকে নিয়োগ করা হয়। তাদের একজন শীয়া, অন্যজন খ্রিস্টান!!

হালাকু খান ও দুই মুসলিম প্রতিনিধির মাঝে গোপন সংলাপ সংঘটিত হয়। হালাকু খান তাদের বাগদাদ পতনে সহযোগিতা প্রদানের শর্তে নানান প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। তন্মধ্যে অন্যতম প্রতিশ্রুতি হলো, তারা দুজন নতুন গভর্নর বড়ির সদস্যপদ প্রাপ্ত হবে এবং তাদের অন্যতম বিবেচিত হবে, যারা পরবর্তীতে ইরাক শাসন করবে। একথা সুস্পষ্ট যে, এগুলো মিথ্যা প্রতিশ্রুতি বৈ কিছুই নয়।

এই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি পেয়ে তারা আব্বাসী সাম্রাজ্য পতনের জন্য পাগলপারা হয়ে ওঠে। যদিও এর বিনিময়ে তারা কিছুই পাবে না। একটু ভেবে দেখুন, যদি আপনাকে এ জাতীয় লোভনীয় প্রতিশ্রুতি (যেমন ক্ষমতা, পদ, সম্পদ) দেওয়া হতো, তবে আপনি কী করতেন? নিঃসন্দেহে তাতারী সশস্ত্র হালাকু খান স্থান-কাল-পাত্রের চাহিদা খুব ভালো বুঝত!

প্রতিনিধি দুজন হালাকু খানের কাছ থেকে অদ্ভুত আবেদন নিয়ে ফিরে এল। বাগদাদের অভ্যন্তরীণ কটর মুসলমান, যারা জিহাদের চেতনায় উজ্জীবিত, জিহাদের হুকুম দেয়, তাদের বিষয়ে ইতিপূর্বেই হালাকু খান শুনেছে। জিহাদের ডাক নিঃসন্দেহে তাদের শান্তিচুক্তিকে ভেঙে চুরমার করে দেবে। তারা ভাবল,

খলিফাতুল মুসলিমীনের আত্মসমর্পণ করা অত্যন্ত জরুরি এবং জিহাদী চেতনায় উজ্জীবিত মুজাহিদ উদ্দীন আইবেক ও সুলাইমান শাহকে আত্মসমর্পণ করা দরকার।

এখানে বর্ণনার বৈপরীত্য পাওয়া যায়। আমি (লেখক) জানি না, তারা বাস্তবে আত্মসমর্পণ করেছিল, না করেনি? তবে সবার সামনে তাতারীদের মতলব সুস্পষ্ট হয়েছে। সবার সামনে শত্রুদের দ্বীন ইসলামকে মিটিয়ে দেওয়ার অভিশাপ প্রতিভাত হয়েছে। হ্যাঁ, খলিফা ক্ষমতার আসনে উপবিষ্ট থাকবে!! যদি হালাকু সত্য বলে থাকে!!

এটা তো জোরজবরদস্তি, অনধিকার চর্চা। খলিফা কি এটি গ্রহণ করবেন? আর কেনই বা গ্রহণ করবেন না। তার পরামর্শদাতারা তাকে বলছে, এটাকে রাজনৈতিক ভাষায় ‘বাস্তবতা’ বলা হয়। যদি আপনি আত্মসমর্পণ না করেন, তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তবে নিশ্চিত বাগদাদের পতন ঘটবে। বাগদাদবাসীর অপমৃত্যু ঘটবে। পক্ষান্তরে যদি আপনি আত্মসমর্পণ করেন। তবে দূরবর্তী হলেও সম্ভাবনা রয়েছে আমরা প্রাণে বাঁচব!!

হ্যাঁ! তিনি লাক্ষিত অবস্থায় বেঁচে থাকবেন! তবুও তো বেঁচে থাকবেন!!

হ্যাঁ! তিনি নতজানু হয়ে বেঁচে থাকবেন! তবুও তো বেঁচে থাকবেন!!

হ্যাঁ! তিনি সবকিছু সস্তায় বিক্রি করে দেবেন! তবুও তো জীবন ফিরে পাবেন!!

খলিফাতুল মুসলিমীন সর্বদাই দ্বিধাশ্রিত ছিলেন।

আর লক্ষ কোটি জনতা তার পেছনে দ্বন্দ্ব ভুগছিল।

জিহাদের ডাক খুব কম মানুষের মুখ থেকেই বের হয়! আর সাধারণ মানুষের অন্তর তাতারী অবরোধের শিকল পায়ে পরার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল।

পার্শ্বিক জগৎ তাদের চোখের সামনে বৃহদাকার মনে হয়েছিল। তাই পার্শ্বিক জগৎকে বলিদান দেওয়া তাদের ভাগ্যে জুটল না।

বস্ত্রত বাগদাদে অন্যায় অপকর্ম বৃদ্ধি পেয়েছিল। আর কোনো জনপদে যখন অন্যায় অপকর্ম ছড়িয়ে পড়ে, ধ্বংস তখন নিকটবর্তী হয়ে পড়ে।

বিষয়টি নিয়ে ভাববার জন্য খলিফার কিছু সময়ের প্রয়োজন ছিল। সিদ্ধান্ত বড়ই কঠিন। তিনি পরামর্শের প্রয়োজন অনুভব করলেন। কিন্তু অপরদিকে হালাকু খানের হাতে নষ্ট করার মতো সময় ছিল না। কারণ, বাগদাদ অবরুদ্ধকারী তাতারী বাহিনীর পেছনে প্রতিদিন হাজার হাজার স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় হচ্ছিল। তখন

ছিল ৬৫৬ হিজরী মুহাররম মাস মোতাবেক ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাস। তখন তীব্র শীত। তা ছাড়া বড় কথা হলো, তাতারী বাহিনী ভেতর থেকে বাগদাদ অবলোকন করার জন্য অস্থির হয়ে ছিল।

অবস্থা ক্রমেই কঠিন ও তীব্রতর হচ্ছে। হালাকু খান ও খলিফার মাঝে দূতের আনাগোনা চলতেই থাকে। এসব দূত মুআইয়িদ উদ্দীন ও মাকিকার কাছে খুব আস্থাভাজন ছিল।

সংলাপের ফলাফল খুবই মনঃপূত হয়েছে বলে ইবনে আলকামী খলিফার সম্মুখে প্রকাশ করেছে। ইবনে আলকামী হালাকু খানের পক্ষ থেকে কতিপয় (মিথ্যা) প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিল। তিনি এসব প্রতিশ্রুতিকে রাজনীতির জন্য কল্যাণকর মনে করেন। তবে কিছু শর্ত ছিল, যা তৎক্ষণাৎ পূরণ করা খলিফার জন্য আবশ্যকীয় ছিল।

প্রতিশ্রুতি ছিল—

১. তাতারীরা দুই সাম্রাজ্যের মাঝে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা এবং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে।

২. লক্ষ লক্ষ মুসলমান হত্যাকারী হালাকু খানের মেয়ের সঙ্গে খলিফাতুল মুসলিমীন মুসতা'সিম বিল্লাহর ছেলে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হবে।

৩. খলিফা মুসতা'সিম বিল্লাহ নিজ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবেন।

৪. তাতারীরা গোটা বাগদাদবাসীকে নিরাপত্তা প্রদান করবে।

এসব প্রতিশ্রুতি নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে বাস্তবায়িত হবে—

১. ইরাকের দুর্গসমূহ ধ্বংস করতে হবে।

২. খন্দকসমূহ ভরাট করতে হবে।

৩. অস্ত্র তাতারীদের হাতে অর্পণ করতে হবে।

৪. বাগদাদের রাজত্ব তাতারীদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।

হালাকু খান প্রেরিত দুই প্রতিনিধির সঙ্গে সংলাপ সমাপ্ত করে। যেন সে এ দেশে ন্যায়-ইনসাফ, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা প্রদানের উদ্দেশ্যে আগমন করেছে এবং এসব কল্যাণকর উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হলে সে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করবে। তখন ইরাকবাসী নিজেদের মতো জীবনযাপন করবে এবং নিজেরাই নিজেদের জন্মভূমি পরিচালনা করবে।

এসব প্রতিশ্রুতি ও শর্ত শুনে খলিফার মনে নতুন করে স্বপ্ন জাগে!!

হালাকু খান কি প্রতিশ্রুতি প্রদানে সত্যবাদী?!

নাকি খলিফার মনে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল?!

উপরন্তু শর্তগুলো ছিল খুবই কঠোর। নিঃসন্দেহে এসব শর্ত যুদ্ধের সকল সম্ভাবনাকে বিলুপ্ত করে দেবে। কিন্তু অপরদিকে হালাকু খান খলিফার সামনে স্বপ্নের প্রদীপ জ্বালিয়েছিল। তা হলো, দেশের রাজত্বে তারা হস্তক্ষেপ করবে না। খলিফার রাজত্ব বহাল থাকবে। তবে তাতারীদের তত্ত্বাবধানে।

বাঁদি আরাফার মৃত্যু

হালাকু খান দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেনি এবং তার বন্ধু ‘খলিফা’ গভীর চিন্তা-ভাবনার জন্য যে সময় চেয়েছিলেন, তাও দেয়নি; বরং তৎকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাগদাদের ওপর পাথর ও আগুন নিক্ষেপ করে সে তাকে দ্রুত চিন্তা-ভাবনা করতে বাধ্য করেছে।

শুরু হয় বাগদাদের ঘর-বাড়ি, প্রাসাদ-অট্টালিকা, দুর্গ-ক্যান্টনমেন্ট ও প্রাচীরের ওপর ভয়াবহ গোলাবর্ষণ। নিরাপদ ও শান্ত শহর (বাগদাদ) তার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো প্রকম্পিত হয়।

সর্বপ্রথম গোলাবর্ষণ শুরু হয় ৬৫৬ হিজরীর সফর মাসে। টানা চারদিন গোলাবর্ষণ চলতে থাকে। উল্লেখযোগ্য কোনো প্রতিবাদ সেখানে দেখা যায় নি। আল্লামা ইবনে কাছীর রহ. *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* গ্রন্থে এ অবস্থার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অতি সংক্ষেপে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন। কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করাননি। তবে তিনি বহু অর্থবহ কথা উল্লেখ করেছেন। ইবনে কাছীর রহ. বলেন—

“তাতারী বাহিনী খেলাফত সাম্রাজ্যকে ঘিরে ফেলেছে। চতুর্দিক থেকে তীর নিক্ষেপ করছে। এমন সময় খলিফার সম্মুখে এক বাঁদি নগ্নগায়ে খলিফার মনোরঞ্জন করছিল। তার গায়েও তীর বিদ্ধ হয়। এটি খলিফার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত ছিল। বাঁদিটির নাম ছিল আরাফা। জানালার ফাঁক দিয়ে তীর এসে বাঁদিকে আঘাত করে। এতে বাঁদিটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। সেই তীরটিকে খলিফার সামনে এসে দাঁড় করানো হয়। তাতে লেখা ছিল—

“إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره، أذهب من ذوي العقول عقولهم”

যখন আল্লাহ তা‘আলা নিজ ফায়সালা বাস্তবায়িত করতে চান, তখন জ্ঞানীদের বিবেক-বুদ্ধি ছিনিয়ে নেন।”

আশ্চর্য! ইবনে কাহীর রহ. এই ঘটনাটি কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই উল্লেখ করলেন!!

বাহ্যদৃষ্টিতে ঘটনাটি খুব স্বাভাবিক মনে হলেও এতে লুকিয়ে আছে বহু মর্মবাণী!!

প্রত্যেক বাগদাদবাসীর হৃদয়ের পার্থিব দুনিয়ার গভীর লোভ গেড়ে বসেছিল। আর সবার পূর্বে যার অন্তরে দুনিয়া চেপে বসেছিল, সেই মহান ব্যক্তি হলেন খলিফাতুল মুসলিমীন। এই হলেন সেই মহান খলিফা, যার স্কন্ধে এহেন ভয়াবহ মুহূর্তে মুসলিম উম্মাহর ঈমান-আমল ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার গুরুদায়িত্ব অর্পিত ছিল। হ্যাঁ, অবশ্যই! বাঁদিটি খলিফার মালিকানাধীন। সে তার জন্য হালাল। বাঁদি খলিফার মনোরঞ্জন করবে, খলিফা একাকী বাঁদিকে ভোগ করবেন, তার নাচ উপভোগ করবেন, এতে কোনো বাধা নেই; কিন্তু খলিফাতুল মুসলিমীনের বিবেক-বুদ্ধি কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল!! ইসলামী খেলাফতের রাজধানী অবরুদ্ধ। কয়েক হাত দূরে মৃত্যুর হাতছানি। মোঙ্গলী গোলাবর্ষণ হচ্ছে। তীরাগ্নি বর্ষিত হচ্ছে। জনমানব চরম সংকটে নিপতিত। এমতাবস্থায় খলিফা বাঁদির নাচ উপভোগ করছেন!!!

কোথায় বিবেক?! কোথায় বুদ্ধি?! কোথায় প্রজ্ঞা?!

বাঁদিভোগ তার রক্ত-মাংসে মিশে গিয়েছিল। আহার পানীয়ের মতো তা মৌলিক চাহিদায় পরিণত হয়েছিল। তাই তো যুদ্ধের মুহূর্তে তা অত্যাবশ্যিকীয় ছিল!! আঘি (লেখক) অনুধাবন করতে পারছি না, কীভাবে তিনি এসব কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখলেন; অথচ দেশ-শহর, জনগণ সবাই, এমনকি তিনি নিজেও সংকটাপন্ন।

রাজভবনে নিষ্কপিত তীর, যেই তীরের আঘাতে অসহায় বাঁদিটি মারা যায়। তার গায়ে তাতারীরা কী চমৎকার অর্থবহ বাণী লিখেছিল। তাতে লিখা ছিল—
“যখন আল্লাহ তা‘আলা নিজ ফায়সালা বাস্তবায়িত করতে চান, জ্ঞানীদের বিবেক-বুদ্ধি ছিনিয়ে নেন।”

সে সময় আল্লাহ তা‘আলা বাগদাদ পতনের ফায়সালা করেছিলেন। তাই তো খলিফা, উপদেষ্টামণ্ডলী ও জনগণ; সকলের বিবেক কেড়ে নিয়েছিলেন।

নিঃসন্দেহে এই নির্বাচিত বাণীটি যুদ্ধের অংশ ছিল; তাতারীরা বাগদাদবাসীকে নিয়ে গবেষণা করে তা বুঝতে পেরেছিল।

এই ঘটনাটি খলিফার বিবেকহীনতা কিংবা বিবেক-স্বল্পতার প্রমাণ বহন করে। কারণ, তিনি এই দুঃখজনক ঘটনার (বাঁদির মৃত্যুর) পরও জনগণকে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেননি। বিপদ-আতঙ্ক রাজত্ববনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। আর তিনি কেবল হেফাজতে থাকার নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

সর্বশেষ পর্যালোচনা

তাতারী বাহিনী ৬৫৬ হিজরীর ১ লা সফর থেকে চারদিন ৪ই সফর পর্যন্ত গোলাবর্ষণ করতে থাকে। ৪ই সফরে পশ্চিমের প্রাচীর ভাঙতে শুরু করে। প্রাচীর ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে খলিফাও সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েন।

জীবনের মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত অবশিষ্ট ছিল।

এমন দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে খলিফা তার বিশ্বাসঘাতক বন্ধু মুআইয়িদ উদ্দীন আলকামীর শরণাপন্ন হন। এহেন পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করেন। সে তাকে সশরীরে হালাকু খানের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেয়, যাতে সংলাপের দ্বার উন্মুক্ত হয়।

দূত হালাকু খানের কাছে গিয়ে খলিফার আগমন সম্পর্কে সংবাদ দেয়। হালাকু খান খলিফাকে আসার নির্দেশ দেয়। কিন্তু একাকী নয়; বরং তার সম্রাজ্যের বিশিষ্ট উপদেষ্টাবৃন্দ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ, মন্ত্রী পরিষদ, ফুকাহা, উলামা ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ আসার নির্দেশ দেয়। নির্দেশমতো তারা সবাই হালাকু খানের তাঁবুতে উপস্থিত হন। হালাকু খানের কথামতো সবার উপস্থিতিতে সংলাপ সংঘটিত হবে।

খলিফার সম্মুখে কোনো সিদ্ধান্ত ছিল না। খলিফা জাতির শ্রেষ্ঠজ্ঞানীদের একত্রিত করেছেন এবং নিজে সশরীরে বাগদাদের প্রাচীর থেকে বের হয়ে হালাকু খানের তাঁবুতে উপস্থিত হয়েছেন। খলিফার দু-চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল, ধমনিতে রক্ত জমাট বেঁধেছিল, হৃদয়ের স্পন্দন থেমে গেয়েছিল, দীর্ঘশ্বাস বের হচ্ছিল।

খলিফা অপমানিত অপদস্থ হয়ে বের হয়েছেন। তিনি তো সেই খলিফাতুল মুসলিমীন, যাকে তার রাজপ্রাসাদে দেশ-বিদেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সংবর্ধনা

জানায়। যার পূর্বপুরুষরা এই প্রাসাদ থেকে সারা পৃথিবী শাসন করতেন। যে প্রাসাদ থেকে আজ তিনি অপমানিত হয়ে বের হয়েছেন।

খলিফার সঙ্গে প্রায় সাতশোজন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের এক মহতি জামাত ছিল। এতে মন্ত্রী মুআইয়িদ উদ্দীন আলকামীও ছিল। দলটি হালাকু খানের তাঁবুর নিকটবর্তী হলে একদল তাতারী পাহারাদার তাদের বাধা প্রদান করে। তারা কাউকে হালাকু খানের তাঁবুতে প্রবেশের অনুমতি দেয় না; বরং তারা বলে, খলিফার সঙ্গে মাত্র সতেরোজন প্রবেশ করবে। পাহারাদারদের ভাষ্যমতে অবশিষ্টদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। খলিফা সতেরো জনকে নিয়ে প্রবেশ করেন। অবশিষ্টদের কোনো কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় না; বরং সকলকে হত্যা করার জন্য বন্দী করা হয়!!

খলিফা ও তার সঙ্গীরা ছাড়া সবাইকে হত্যা করা হয়। নিহত হয় জাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, মন্ত্রী পরিষদ, জ্ঞানীগুণীরা, বিশিষ্ট ফুকাহায়ে কেরাম ও উলামায়ে কেরাম।

খলিফাকে হত্যা করা হয়নি। কারণ, হালাকু খান তার মাধ্যমে কিছু স্বার্থ উদ্ধার করার ইচ্ছা করেছিল।

হালাকু খান গর্বভরে অহংকারবশত বিষয়গুলো প্রকাশ করতে থাকে।

খলিফা বুঝতে পারেন, দলের সবাইকে হত্যা করা হয়েছে। এতদিনে খলিফার কাছে তাতারীদের স্বভাব প্রকাশ পায়। তিনি বুঝতে পারেন, তাতারীদের কোনো প্রতিশ্রুতি নেই, তাদের নিরাপত্তা প্রদান মূলত বিপদের কারণ।

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً

“তারা কোনো মুমিনের সঙ্গে আত্মীয়তা ও অঙ্গীকারের মর্যাদা রক্ষা করে না।”^{৪৫}

খলিফা একথাও বুঝতে পেরেছিলেন যে, অধিকার রক্ষার জন্য এমন শক্তি সঞ্চয় করা উচিত, যা অধিকারকে সুরক্ষিত রাখবে। সুতরাং যদি আপনি শক্তি সঞ্চয় না করার কারণে অধিকার খর্ব হয়, তবে নিজেকেই ধিক্কার দিন। কিন্তু আফসোস! খলিফা অনেক পরে তা বুঝতে পেরেছেন।

হালাকু খানের পক্ষ থেকে কড়া আদেশাবলি

খলিফা বাগদাদবাসীকে নির্দেশ দেবেন, যেন তারা সকল অস্ত্র অর্পণ করে এবং কোনো প্রকার আন্দোলন বা প্রতিরোধ না করে। এটি একটি সহজ বিষয় ছিল। কারণ, বাগদাদবাসী অস্ত্রবহন করতে পারত না এবং তাতারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না।

খলিফাকে বন্দী করে বাগদাদ নিয়ে যাওয়া হবে। যেন তিনি তাতারীদেরকে আব্বাসীদের ধন-সম্পত্তির সন্ধান দেন। স্বর্ণ, রূপা, মূল্যবান আসবাবপত্র এবং রাজপ্রাসাদ ও বাইতুল মালের দামি জিনিসপত্রের সংবাদ দেন।

খলিফার চোখের সামনে তার দুই সন্তানকে হত্যা করা হবে। নির্দেশমতো তা-ই করা হয়। তার চোখের সামনে তার বড় ছেলে আহমদ আবুল আব্বাস ও মেঝো ছেলে আবদুর রহমান আবুল ফাজায়েলকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। আর তৃতীয় ছেলে মুবারক আবুল মানাকেও বন্দী করা হয়। অনুরূপ তিন কন্যা ফাতেমা, খাদিজা ও মারয়ামকেও বন্দী করা হয়।

বাগদাদ থেকে নির্দিষ্ট কতিপয় লোককে ডেকে আনা হয়। ইবনে আলকামী এদের নামের তালিকা হালাকু খানকে দিয়েছিলেন। তারা ছিল হাদীস বিশারদ। ভেতরে ভেতরে ইবনে আলকামী তাদের প্রচণ্ড ঘৃণা করত। বাস্তবেই তাদের সবাইকে ডেকে আনা হয়। তারা এক এক করে ঘর থেকে বের হয়। সঙ্গে তাদের সন্তান ও স্ত্রীরাও বের হয়। বাগদাদের বাইরে কবরস্থানের পাশে তাদের নিয়ে ছাগল জবাই করার মত জবাই করা হয়। আর তাদের স্ত্রী-সন্তানদের বন্দী কিংবা হত্যা করার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়। আপনি যেভাবেই দেখুন না কেন, এটি ছিল হৃদয়বিদারক মর্মভ্রুদ ঘটনা।

এই প্রক্রিয়ায় বিশ্বের অন্যতম আলেমে দ্বীন, দারুল খেলাফতের উস্তাদ শায়েখ মুহিউদ্দীন ইউসুফ ইবনে শায়েখ আবুল ফরজ ইবনে জাওয়াইর রহ. এবং তার তিন সন্তান আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান ও আবদুল করীমকেও জবাই করা হয়। মুজাহিদ উদ্দীন আইবেক ও তার সঙ্গী সুলাইমান শাহকে জবাই করা হয়, যে দুইজন বাগদাদে সর্বপ্রথম জিহাদের ডাক দিয়েছিলেন। জবাই করা হয় খলিফাতুল মুসলিমীনের উস্তাদ ও অভিভাবক সদর উদ্দীন আলী ইবনে নায়ার রহ. কে। এরপর মসজিদের খতিব, ইমাম ও হাফেজে কুরআনদের জবাই করা হয়!!

এসব কিছু খলিফার চোখের সামনে সংঘটিত হয়। খলিফা নিখর চোখে নির্মম জবাইযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করছিলেন। আমি জানি না, খলিফা ব্যাথা, লজ্জা, লাঞ্ছনা ও ভয় কি গোপন করেছিলেন? নিঃসন্দেহে রাজ্য পরিচালনার রূপরেখা ভিন্ন হতো, যদি খলিফা জানতেন যে, শেষ পরিণাম এমন হবে। কিন্তু আল্লাহর অবধারিত নীতি—‘অতীত কখনো ফিরে আসে না’। এরপর খলিফা দেখতে পান যে, হালাকু খান ইবনে আলকামীর সঙ্গে সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করছে। তাদের মাঝে গভীর বন্ধুত্ব। এতক্ষণে খলিফার সামনে এসব কিছুর রহস্য দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়। অযোগ্যকে দায়িত্ব প্রদানের ফলাফল তিনি জানতে পারেন। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে যায়!!

বাগদাদ দখল

বাগদাদবাসী অস্ত্র অর্পণ করা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সুবিশাল জামাত নিহত হওয়া এবং হালাকু বাহিনী বাগদাদের রাস্তা-ঘাট সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার পর হালাকু খান তার মূল টার্গেট বাস্তবায়ন শুরু করে। তা হলো, ‘মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী বাগদাদ দখল।’ বাগদাদ দখল অর্থ হলো, তাতারী বাহিনী বাগদাদে যা ইচ্ছা করতে থাকে। হত্যা, বন্দী, চুরি, অশ্লীল কর্ম, ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। মোটকথা তাতারী বাহিনীর পক্ষে যা যা করা শোভনীয় তারা তা-ই করে!!

বর্বর তাতারী বাহিনীর কীটপতঙ্গ মুসলমানদের শরীরে অনুপ্রবেশ করে।

সুবিশাল বাগদাদ নগরী তাতারীদের দখলে চলে যায়।

আল্লাহুমা লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

এই নগরী থেকে কত বাহিনী আল্লাহর পথে জিহাদ করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল!!

কত শত উলামায়ে কেরাম দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই নগরীতে দরসগাহ বানিয়েছিলেন!!

কত তালেবুল ইলম (ছাত্র) পৃথিবীর আনাচে-কানাচে থেকে ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে এই নগরীতে এসেছিলেন!!

আহ! হায় বাগদাদ! আজ তোমার জন্য কেউ বেঁচে নেই!

কোথায় খালেদ ইবনে ওয়ালিদ?

কোথায় মুছান্না ইবনে হারেছা?

কোথায় কাঁকা ইবনে আমর?

কোথায় নুমান ইবনে মুকরিন?

কোথায় সাঁদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস?

কোথায় সে মানবতার বাহাদুরী?

কোথায় মুসলিম প্রজন্মের বিবেক-বুদ্ধি?

কোথায় ইজ্জত-সম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধ?

কোথায় জান্নাতাকাজ্জী পবিত্র জামাত?

কোথায় আল্লাহর পথের যোদ্ধারা?

কোথায় তারা, যারা নিজেদের ইজ্জত-সম্মান, স্ত্রী-সন্তান, ঘর-বাড়ি ও ধন-সম্পত্তি রক্ষায় লড়াই করে?

কোথায়? কোথায়?!

কেউ নেই!!

আজ বাগদাদ মৃত লাশের জন্য উন্মুক্ত।

কোনো যুদ্ধ নেই, কোনো প্রতিবাদ নেই।

বাগদাদে কোনো পুরুষ বেঁচে নেই। আছে কেবল পুরুষরূপী কিছু কাপুরুষ!! সুবিশাল বাগদাদ নগরী দখল হয়ে যায়।

ইমাম আবু হানীফার শহর, ইমাম শাফেয়ীর শহর, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের শহর আজ তাতারীদের দখলে।

খলিফা মামুনুর রশিদের শহর আজ অন্যের দখলে, যিনি এক বছর হজ্জ করতেন, আরেক বছর জিহাদ করতেন।

দখল হলো রোমের অঞ্চল আমুরিয়ার বিজেতা খলিফা মু'তাসিম বিল্লাহর শহর।

পাঁচ যুগ পূর্বেকার ইসলামের প্রাণকেন্দ্র (রাজধানী) আজ বিজাতিদের দখলে!! তাতারীরা বাগদাদ নগরীতে এমন কাজ করেছে, যা কল্পনাও করা সম্ভব নয়।

তাতারীরা ঘরে ঘরে, বাগানে বাগানে, রাস্তা-ঘাটে, শহর-বন্দরে, মসজিদে মসজিদে মুসলমানদের খুঁজতে থাকে। মুসলমানদের ব্যাপকভাবে হত্যা করতে থাকে। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! মুসলমানরা পালাতে থাকে। ঘরের দরজা বন্ধ করে দরজা ধাক্কা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তাতারীরা দরজায় আগুন লাগিয়ে দেয় কিংবা দরজা ভেঙে ফেলে। এরপর ঘরে প্রবেশ করে। মুসলমানরা ভয়ে দৌড়ে বাড়ির ছাদে আশ্রয় নেয়। তাতারীরা পিছে পিছে ছাদে

ওঠে। এরপর সেখানেই মুসলমানদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। মুসলমানদের রক্তে শহরের ড্রেন-নালা ভেসে যায়।

তাতারীরা শক্তিশালী পুরুষদের হত্যা করেই ক্ষান্ত থাকে নি, বরং বৃদ্ধ ও অচলদেরও হত্যা করেছে। তারা মহিলাদেরও হত্যা করেছে। তবে কোনো মহিলাকে তাদের ভালো লাগলে বন্দী করে নিয়ে যেত। তাদের হত্যাকাণ্ড থেকে ছোটরাও রেহায় পায়নি—এমনকি দুগ্ধপোষ্য শিশুও। মোটকথা নারী-পুরুষ ও শিশু-বৃদ্ধ কারো প্রতিই এই পশুরা কোনো দয়া করে নি। যাকে পেয়েছে তাকেই খুন করেছে; পেট ফেড়ে গর্ভের সন্তান পর্যন্ত।

একদল তাতারী চল্লিশজন ছোট শিশুকে রাস্তার কিনারা পড়ে থাকে দেখে। তাদের মায়েদের খুন করা হয়েছিল। এই পশুরা তাদেরও হত্যা করে!!

তাদের অন্তর ছিল পাথরের মতো। না, পাথরের চেয়েও কঠোর!!

নিহতের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে।

এক, দুই, তিন এভাবে দশদিন অতিবাহিত হলো। খুন, হত্যা বন্ধ হচ্ছিল না। অবিরাম ধ্বংসযজ্ঞ চলছিল। কিন্তু কোনো প্রতিরোধ কিংবা প্রতিবাদ নেই। মানুষের অন্তরে একথা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, তাতারীরা অপরাজেয়। তাদের পরাজিত করা সম্ভব নয়। তাদেরকে আঘাত করা সম্ভব নয়। হয়তো তারা কখনো মারা যাবে না।

এসব কিছু খলিফার উপস্থিতিতে সংঘটিত হচ্ছিল। খলিফা স্বচক্ষে এ আজাব প্রত্যক্ষ করছিলেন।

আপনি একটু ভেবে দেখুন, খলিফার উপস্থিতিতে এসব ঘটনা ঘটছে?!

একটু ভেবে দেখুন, খলিফা ইবনুল খুলাফা (খলিফার সন্তান খলিফা) আযীম ইবনুল উজামা (বাদশার ছেলে বাদশা) বন্দী অবস্থায় এসব মর্মস্ৰুদ ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিলেন!!

১. তার দুই সন্তানকে খুন করা হয়েছে।

২. তৃতীয় সন্তানকে বন্দী করা হয়েছে।

৩. তিন মেয়েকে বন্দী করা হয়েছে।

৪. রাজসভার মন্ত্রীদের হত্যা করা হয়েছে।

৫. শহরের সকল উলামায়ে কেরাম, খতিব ও হাফেজে কুরআনদের খুন করা হয়েছে।

৬. সবচেয়ে নিকটবর্তী মানুষ মুআইয়িদ উদ্দীন আলকামীর বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ পেয়েছে।

৭. তার সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে।

৮. তার ধন-সম্পত্তি, অর্থ-সম্পদ সবকিছু ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। শহর দখল হয়েছে।

৯. চোখের সামনে লক্ষ লক্ষ শহরবাসীকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে।

১০. আব্বাসী সাম্রাজ্যের রাজধানী জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিল্ডিং-প্রাসাদ বিধ্বস্ত করা হয়েছে।

১১. তাতারীরা নির্মম, নিষ্ঠুর, অকৃতজ্ঞ, কালো চেহারা নিয়ে গোটা বাগদাদে ছড়িয়ে পড়েছে। শস্যখেতে পঙ্গপাল ছড়িয়ে পড়ে শস্যখেত যেমন ধ্বংস করে ফেলে অনুরূপ তারা বাগদাদে ছড়িয়ে পড়ে বাগদাদকে ধ্বংস করে ছেড়েছে।

১২. শিকল পরানো হয়েছে তার গর্দানে, হাতে ও পায়ে এবং উটকে যেভাবে হাঁকিয়ে নেওয়া হয় তাকেও সেভাবে টেনে-হেঁচড়ে হাঁকিয়ে নেওয়া হয়েছে।

এসব কিছু খলিফা নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করছিলেন।

আফসোস আর আক্ষেপের কোনো অন্ত ছিল না।

নিঃসন্দেহে তিনি বার বার বলেছিলেন—

يَا لَيْتَنِي مِثُّ قَبْلِ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًا مَّنْسِيًّا

“হায়! আমি যদি এর আগেই মারা যেতাম এবং সম্পূর্ণ বিস্মৃত বিলুপ্ত হয়ে যেতাম।”^{৪৬}

নিঃসন্দেহে তিনি অনুতপ্ত হয়ে বলেছিলেন—

مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهُ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ

“আমার অর্থ-সম্পদ আমার কোনো কাজে আসল না। আমার থেকে আমার সব ক্ষমতা লুপ্ত হয়ে গেল।”^{৪৭}

নিঃসন্দেহে তিনি মনে মনে বলেছিলেন এবং তার অবস্থাও একথার সাক্ষ্য দিচ্ছিল—

^{৪৬} সূরা মারইয়াম : ২৩।

^{৪৭} সূরা হাক্বাহ : ২৭-২৮।

رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ

“হে আমার প্রতিপালক, আমাকে পুনরায় প্রেরণ করো। যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি পূর্বে করিনি।”^{৪৮}

হায়! যদি আমি সৈন্যবাহিনীকে প্রস্তুত করতাম। তাদের শক্তিশালী বানাতাম!!

হায়! দ্বীনের শত্রুরা চারদিক থেকে যখন দ্বীনকে ঘিরে ফেলেছিল, তখন যদি আমি এ জাতিকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করতাম!!

হায়! যদি আমি মানুষের সামনে; বরং অন্তরে ইসলামকে সমুল্লত করতাম এবং ইসলাম তাদের জান-মালের চেয়ে তাদের কাছে অধিক মূল্যবান হতো!!

হায়! যদি আমি খেল-তামাশা, রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে দিতাম!!

হায়! যদি আমি সম্পদ সঞ্চয়ের জন্য বেঁচে না থাকতাম!!

হায়! যদি আমি প্রচুর বাঁদি না রাখতাম।

হায়! যদি আমি গানবাদ্য না শুনতাম।

হায়! যদি আমি উত্তম সঙ্গী নির্বাচন করতাম!!

হায়! যদি আমি উলামায়ে কেরামকে সম্মান করতাম, শত্রুদের বর্জন করতাম!!

হায়! আফসোস! হায়! আফসোস! হায়! আক্ষেপ!!

কিন্তু শিকলাবদ্ধ গর্দান, হাত, পা তাকে বাস্তবতার মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে। তিনি যেন একথা জানতে পারেন যে, অতীত কখনো ফিরে আসে না। সময় কখনো পেছনের দিকে ফিরে যায় না!

ইমাম আবু দাউদ ও আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذَلًّا، لَا يَتْرَعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ.

“তোমরা যখন সুদি লেনদেন করবে, গরুর লেজ ধরবে (চতুষ্পদ জন্তু লালন করবে) চাষাবাদে সন্তুষ্ট থাকবে (অর্থাৎ জিহাদের সময় দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত থাকবে) এবং জিহাদ ছেড়ে দেবে, তখন আল্লাহ রব্বুল আলামীন তোমাদের ওপর লাজ্জনা চাপিয়ে দিবেন। যতক্ষণ তোমরা

^{৪৮} সূরা মুমিনুন : ৯৯-১০০।

দ্বীনের দিকে ফিরে না আসবে, ততক্ষণ আল্লাহ এই লাঞ্ছনা দূর করবেন না।”^{৪৯}

বাগদাদবাসী কৃষিকাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, রচনা-সংকলন এবং বিভিন্ন শিল্পকর্ম ইত্যাদি পেশায় জড়িত ছিল। এমনকি ইলম অর্জন ও বিতরণও তাদের পেশা ছিল। কিন্তু তারা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ বর্জন করেছিল। ফলে এর ফলাফল ছিল লাঞ্ছনা আর অপমান। যা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।

এটি প্রত্যেক মুসলমান নর-নারী, শাসক-শাসিত, ছাত্র-উস্তাদ, ছোট-বড় সকলের জন্য মূল্যবান শিক্ষণীয় বিষয়।

—সত্য প্রতিষ্ঠা ও হক আদায়ের জন্য শক্তি প্রয়োজন।

—অধিকার সহজলভ্য নয়; অধিকার আদায় করতে হয়। অধিকার আদায়ের পথে মূল্য ব্যয় করতে হয়।

—যারাই জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে, তারাই লাঞ্ছিত হয়েছে।

—মুসলমানদের শত্রুরা কখনো প্রতিশ্রুতি পূরণ করে না।

পদাঘাতে মৃত্যু

এবার খলিফাকে হত্যা করার পালা। হালাকু খান অসহায় খলিফাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। এমন সময় হালাকু খানের কতিপয় সহযোগী তাকে এক অদ্ভুত পরামর্শ প্রদান করে। তারা তাঁকে বলে, যদি মুসলিম খলিফার রক্ত মাটিতে প্রবাহিত হয়, তবে পরবর্তীতে মুসলমানরা বদলা নিতে চাবে; দীর্ঘদিন পরে হলেও। তাই খলিফাকে এমন পন্থায় হত্যা করা হোক, যাতে রক্ত মাটিতে প্রবাহিত না হয়। তলোয়ার ব্যবহারের কোনো প্রয়োজন নেই।

এটি এক ধরনের প্রতারণা। কারণ, মুসলমানরা শুধু খলিফা হত্যার নয়; বরং হালাকু খান ও তার বাহিনী যত মুসলমানকে হত্যা করেছে, তাদের প্রতিশোধ অবশ্যই গ্রহণ করবে। চাই যে পন্থায়ই তাদের হত্যা করা হোক। তবুও হালাকু খান তাদের কথায় কান দিল। সুবহানাল্লাহ! যেন আল্লাহর অভিপ্রায় এমনই ছিল। খলিফা এমন লাঞ্ছনাকর পন্থায় নিহত হলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো খলিফা এভাবে মৃত্যুবরণ করেননি। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে পৃথিবীর কোনো রাজা-বাদশার ব্যাপারে এমন লাঞ্ছনাকর ঘটনা শোনা যায়নি।

^{৪৯} আবু দাউদ : ৩৪৬২।

হালাকু খান খলিফাকে ‘পদাঘাতে খুন’ করার নির্দেশ দিল!!

কার্যত খলিফাকে মাটিতে শোয়ানো হয়। আর তাতারী বাহিনী খলিফাকে লাথি মারতে শুরু করে।

পদাঘাত খলিফাকে মৃত্যুর কোলে পৌঁছে দেয়!!

আহ! কী ব্যথা! আহ! কী লাঞ্ছনা! আহ কী অপমান অপদস্থতা!

শরীর থেকে রুহ পৃথক হওয়া পর্যন্ত তারা তাকে লাথি মারতে থাকে।

ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

শুধু বাগদাদের পতন ঘটেনি!!

বাগদাদে আব্বাস গোত্রের সর্বশেষ খলিফারও পতন ঘটে।

সাথে সাথে গোটা বাগদাদবাসীর পতন হলো।

এটি ছিল ১৪ই সফর ৬৫৬ হিজরী তথা তাতারীদের বাগদাদ প্রবেশের দশম দিন।

খলিফা হত্যার পরও হত্যাকাণ্ড শেষ হয়নি। হালাকু খান (তার ওপর আল্লাহর অভিষাপ নাজিল হোক) লাগাতার হত্যাকাণ্ড চলিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। বাগদাদ ছিল তৎকালীন বিশ্বের সর্ববৃহৎ শহর। তাই তাতারীরা এই শহরটিকে পরবর্তীদের জন্য ‘শিক্ষণীয় শহর’ বানাতে চাইল।

বাগদাদ পতনের পর আরও চল্লিশদিন অবিরাম হত্যাকাণ্ড চলল।

একটু ভেবে দেখুন! বাগদাদে নিহতের সংখ্যা কত হতে পারে?!

পুরুষ, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ মুসলমান নির্মম হত্যা করা হয়। মাত্র চল্লিশ দিনে লক্ষ লক্ষ মুসলমান খুন হয়!!

মাত্র চল্লিশদিনের মাঝে বাগদাদ লক্ষ লক্ষ অধিবাসী হারিয়েছে। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক ভয়াবহ ঘটনা।

একথা এজন্য উল্লেখ করছি যে, বর্তমানে মুসলমানগণ যেসব বিপদাপদ ও বালা-মসিবতের সম্মুখীন হয়, তা যত কঠিনই হোক না কেন তা পূর্ববর্তীদের বিপদ তুলনায় খুবই হালকা। আপনি দেখবেন, আল্লাহর ইচ্ছায় মুসলমানরা আবার ঘুরে দাঁড়াবে। এ থেকে বোঝা যায়, আল্লাহর ইচ্ছায় কোমর ভেঙে গেলেও আমরা আবার কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারি।

বাগদাদে কেবল খ্রিস্টানরাই খুনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল!!

সংখ্যাগরিষ্ঠ তাতারী যখন মুসলিম-নিধনে ব্যস্ত, নির্মম হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত, তখন একদল তাতারী ভিন্ন অপরাধকর্মে জড়িয়ে পড়ে। তারা এই অপরাধের মাধ্যমে মুসলিম জাতির অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করেছে, যা কোনো দিন পূরণ হওয়ার নয়। মুসলমানদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চা দেখে তাতারীদের গা জ্বলে যাচ্ছিল। তারা দেখল সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে মুসলমানরা তাদের চেয়ে বহুধাপ এগিয়ে। কারণ, মুসলমানদের জ্ঞানচর্চা, শিক্ষা-দীক্ষার রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। মুসলমানদের মাঝে জাগতিক ও পারলৌকিক বিভিন্ন শাস্ত্রে প্রায় দশ হাজার আলেম গুণীজন রয়েছেন। এ সকল বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ হাজার হাজার কিতাবাদি রচনার মাধ্যমে ইসলামী সভ্যতার বিশ্বময় বিস্তার ঘটিয়েছেন। অথচ তাতারীদের নেই কোনো সভ্যতা, না আছে কোনো সংস্কৃতি। তাদের মূল ভিত্তি বলতে কিছুই নেই। তারা তো হঠাৎ গজে ওঠা পরগাছা। যারা চীনের উত্তর মরুভূমিতে বেড়ে উঠেছে। তারা তো জংলি সভ্যতায় লালিত হয়েছে। তাই তো তারা জীবজন্তুর মতো লড়াই করে। এমনকি তারা জীবজন্তুর মতোই জীবনযাপন করে। এই পৃথিবীকে আবাদ করা কিংবা পৃথিবীর কল্যাণসাধনের কোনো ইচ্ছা তাদের নেই। তাদের বেঁচে থাকার মূল উদ্দেশ্য হলো জ্বালাও, পোড়াও, ধ্বংসযজ্ঞ ও হত্যাকাণ্ড। তাদের মাঝে ও উন্মত্তে মুসলিমার মাঝে বিস্তার ব্যবধান। এমনকি পৃথিবীর অন্য যেকোনো জাতি থেকে তারা বহুগুণ পিছিয়ে।

বাগদাদের ইতিহাসে যে ধ্বংসলীলা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, তা পৃথিবীর ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা মুশকিল নয়; বরং অসম্ভব।

পাপিষ্ঠ তাতারী বাহিনীর জঘন্য অভিপ্রায়

এই মানবরূপী পশুরা যেই জঘন্য অপরাধের ইচ্ছা করেছিল, তা হলো, বাগদাদের সুবিশাল গণপাঠাগারকে ধ্বংস করা। তা ছিল তৎকালীন বিশ্বের সর্ববৃহৎ পাঠাগার। এই পাঠাগারটি ছয়শো বছর যাবৎ মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার নির্যাস বহন করত। সকল বিষয়ের সকল শাস্ত্রের সব কিতাবাদি এই পাঠাগারে সংগ্রহ করা হয়েছিল—শরয়ী জ্ঞানশাস্ত্র যেমন : তাফসীর, হাদীস, ফেকাহ, আকীদা, আখলাক ইত্যাদি, সাধারণবিদ্যা যেমন : চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রকৌশলবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, ভূগোল ইত্যাদি শাস্ত্রের বহু মূল্যবান বইপত্র এই পাঠাগারে সংরক্ষিত ছিল। তা ছাড়া অসংখ্য